বাংলা ঃ

প্রাচীনকালে বাংলার বিভিন্ন অঞ্চল ভিন্ন ভিন্ন নামে পরিচিত ছিল। উত্তরবঙ্গ *পুণ্ড্র* ও *বরেন্দ্র* নামে, পশ্চিমবঙ্গ *রাঢ়* ও *তাম্রলিপ্ত* নামে, পূর্ব ও দক্ষিণবঙ্গ *বঙ্গাল, হরিকেল, সমতট, চাঁদ* প্রভৃতি নামে পরিচিত

Scanned by CamScanner

ছিল। মুসলমানদের আগমনের পরই এদেশ একত্রে *'বাংলা'* বা *'বাঙালা'* নামে পরিচিত হয়। পরবর্তীকালে সমগ্র বাংলাদেশ *'গৌড়'*ও *'বঙ্গ'* নামে সাধারণভাবে পরিচিত হয়েছে। উত্তরে হিমালয় পর্বত থেকে দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর এবং পূর্বে গারো ও লাশাই পর্বত থেকে পশ্চিমে রাজমহল পর্যন্ত সমতলভূমি নিয়ে বাংলাদেশ গঠিত। ছোটো-বড়ো একাধিক নদনদী বাংলাকে শস্যশ্যামল করে তুলেছে।

বাংলাদেশের আদি অধিবাসীরা আর্যজাতির বংশোদ্ভূত নয় বলেই পণ্ডিতদের অনুমান। আর্যদের আগমনের পূর্বে বিভিন্ন অনার্য জাতি এই ভূখণ্ডে বসবাস করত। বৈদিকযুগের একেবারে শেষদিকে বাংলায় আর্যসভ্যতার অনুপ্রবেশ ঘটেছে। ক্রমে আর্যদের ভাষা, ধর্ম ও বিভিন্ন সামাজিক রীতিনীতি বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

গুপ্তযুগের পূর্বে প্রাচীন বাংলার কোনো ধারাবাহিক ইতিহাস রচনা করা সম্ভব হয়নি। একটি মত অনুযায়ী বাংলা ছিল গুপ্তদের আদি বাসস্থান। এই মত সত্য হলে বলতে হয় যে, প্রথম চন্দ্রগুপ্ত বা তার পূর্ববর্তী রাজাদের সময় থেকেই 'বঙ্গ' গুপ্ত সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল। তা যদি না-ও হয়ে থাকে, সমুদ্রগুপ্ত যে সমতট (পূর্ববঙ্গ) বাদে বাংলার বেশিরভাগ অংশই নিজ সাম্রাজ্যভুক্ত করেছিলেন, তাতে সন্দেহ নেই। কারণ 'এলাহাবাদ লেখ'তে সমতটকে তাঁর রাজ্যের প্রত্যন্ত প্রদেশ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। *প্রথম কুমারগুপ্ত, বুধগুপ্ত, বৈন্যগুপ্ত* এবং সম্ভবত *বিষ্ণুগুপ্তের* একাধিক শিলালেখ দামোদরপুর, ধনিয়াদহ, পাহাড়পুর, গুনাইঘর ইত্যাদি স্থানে পাওয়া গেছে। এ থেকে বোঝা যায় যে, গুপ্ত শাসনের শেষ পর্যায়েও বাংলার অন্তত কিছু অংশের ওপর গুপ্ত রাজাদের কর্তৃত্ব বজায় ছিল। গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের পর সমগ্র উত্তর ভারতের মতো বাংলাতেও ক্ষুদ্র স্বাধীন রাজ্যের উদ্ভব ঘটেছিল। এর মধ্যে সমতটে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল একটি রাজ্য। লেখ থেকে এই বংশের তিনজন শাসকের নাম জানা যায়। এঁরা হলেন *গোপচন্দ্র, ধর্মাদিত্য* ও *সমাচারদেব*। তবে নাম ছাড়া এঁদের সম্পর্কে আর বিশেষ কিছু জানা যায় না। বাংলার প্রকৃত গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়ের সূচনা হয় শশাঙ্কের নেতৃত্বে স্বাধীন গৌড় রাজ্য প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে।

শশাঙ্কের নেতৃত্বে গৌড়ের উত্থান ঃ

গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের পর পরবর্তী গুপ্ত নামধারী রাজাগণ গৌড়ে স্বাধীনভাবে রাজত্ব করতেন। উত্তরবঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গের কিছু অংশ নিয়ে গৌড় জনপদ গঠিত ছিল। গুপ্তরাজ বৈন্যগুপ্তের মৃত্যুর পর থেকে কনৌজের মৌখরী রাজগণ গৌড় দখলের চেষ্টা করেন। এই কারণে পরবর্তী গুপ্তদের সাথে মৌখরীদের নিরন্তর যুদ্ধ চলে। সেইসঙ্গে চালুক্যবংশীয় রাজাগণও বারবার গুপ্তদের আক্রমণ করতে থাকে। ফলে গুপ্তগণ ক্রমশ হীনবল হয়ে পড়েন। সেই সুযোগে শশাঙ্ক গৌড়ে একটি স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন (৬০৬ খ্রিঃ)।

শশাঙ্কের রাজত্বকাল সম্বন্ধে জানার জন্য আমাদের মূলত বাণভট্টের *'হর্ষচরিত'*ও হিউয়েন সাঙ-এর *'বিবরণ'*-এর ওপর নির্ভর করতে হয়। কিন্তু বাণভট্ট ছিলেন শশাঙ্কের বিরোধী এবং হিউয়েন-সাঙ ছিলেন হর্ষের সাহায্যপ্রাপ্ত। এই কারণে দুজনেরই বিবৃতি পক্ষপাতমূলক ছিল বলে মনে হয়।

শশাঙ্কের বংশপরিচয় বা বাল্যজীবন সম্পর্কে সঠিক কিছু জানা যায়নি। শশাঙ্কের কিছু মুদ্রায় *'নরেন্দ্রগুপ্ত'* বা *'নরেন্দ্রাদিত্য'* নামটি পাওয়া গেছে। এ থেকে অনেকে মনে করেন, তিনি গুপ্তবংশীয় শাসক ছিলেন। কিন্তু রোহিতাশ্বের (রোটাসগড়) গিরিগাত্রে *'শ্রীমহাসামন্ত শশাঙ্ক'* এই নামটি খোদিত আছে। এখানে সম্ভবত গৌড়রাজ শশাঙ্কের কথাই বলা হয়েছে। তা যদি হয়, তাহলে শশাঙ্ক প্রথম জীবনে একজন সামন্ত নরপতি ছিলেন বলা যায়। এখন প্রশ্ন হল ঃ তাঁর প্রভু কে ছিলেন? *ড. বি. সি. সেন,*

Scanned by CamScanner

ডি. সি. গাঙ্গুলী প্রমুখ মনে করেন যে, শশাঙ্ক মৌখরীদের অধীন সামন্ত নৃপতি ছিলেন। কিন্তু ষষ্ঠ শতকের শেষভাগে পরবর্তী গুপ্তরাজ *মহাসেনগুপ্ত* মগধে রাজত্ব করতেন। সুতরাং শশাঙ্ক এঁরই অধীন সামন্ত নৃপতি ছিলেন বলে মনে হয়।

ড. মজুমদারের মতে, *"শশাঙ্কই প্রথম বাঙালি রাজা, যিনি আর্যাবর্তে সার্বভৌম শাসন প্রতিষ্ঠিত করেন।"* সামান্য সামন্ত থেকে নিজ বাহুবলে তিনি বিশাল সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হয়েছিলেন। তাঁর রাজধানী ছিল মুর্শিদাবাদ জেলার 'কর্ণসুবর্ণ'। সিংহাসনে বসেই তিনি রাজ্যবিস্তারে উদ্যোগী হন। গৌড়ের অধিপতি হিসেবে উত্তর ও পশ্চিম বাংলার ওপর প্রথম থেকেই তাঁর আধিপত্য ছিল। 'মেদিনীপুর লেখ' থেকে জানা যায় যে, দণ্ডভুক্তি অর্থাৎ মেদিনীপুর জেলার 'দাঁতন' ও 'উৎকল' (বালেশ্বর অঞ্চল) জয় করেন। এই অঞ্চল দুটি তাঁর সামন্তদের দ্বারা শাসিত হত। শশাঙ্কের অষ্টম রাজ্যবর্ষের 'প্রথম মেদিনীপুর লেখ' থেকে জানা যায় যে, *মহাপ্রতিহার শুভকীর্তি* দণ্ডভুক্তি শাসন করতেন। 'দ্বিতীয় মেদিনীপুর লেখ' অনুযায়ী উৎকলের শাসক ছিলেন *মহাবলাধিকৃতি সোমদত্ত*। উড়িষ্যার কোঙ্গদ (গঞ্জাম জেলা) অঞ্চলে রাজত্বকারী শৈলোদ্ভব রাজবংশও তাঁর বশ্যতা স্বীকার করে। কারণ এই বংশের রাজা দ্বিতীয় মাধবরাজ শশাঙ্ককে তাঁর অধিরাজ বলে স্বীকার করেছিলেন। সম্ভবত উৎকল ও কোঙ্গদ জয় করার জন্য তাঁকে এই অঞ্চলে স্বাধীনভাবে রাজত্বকারী মান রাজাদের পরাস্ত করতে হয়েছিল। তাম্রফলকে একজন গৌড়রাজের উল্লেখ আছে যিনি কামরূপরাজ ভাস্করবর্মনকে পরাস্ত করেছিলেন। পণ্ডিতগণ মনে করেন যে, এই গৌড়রাজ ছিলেন শশাঙ্কই। মগধও সম্ভবত প্রথম থেকেই তাঁর রাজ্যভুক্ত ছিল।

পূর্ব ভারত বিজয়ের পর শশাঙ্ক পশ্চিম ভারত বিজয়ে অগ্রসর হন। পশ্চিম কনৌজ রাজ্যের মৌখরীরা ছিল গৌড়ের শত্রু। থানেশ্বরের রাজা প্রভাকরবর্ধনের কন্যা রাজশ্রীর সঙ্গে কনৌজের মৌখরীরাজ গ্রহবর্মনের বিবাহ হবার ফলে উভয় দেশের মধ্যে মৈত্রীজোট গড়ে উঠেছিল। এই অবস্থায় শশাঙ্ক থানেশ্বরের শত্রু মালবরাজ দেবগুপ্তের সাথে পালটা মৈত্রীজোট গঠন করেন। এইভাবে শক্তিসংগ্রহের পর শশাঙ্ক ও দেবগুপ্ত কনৌজ আক্রমণ করে গ্রহবর্মনকে হত্যা করেন এবং রাজ্যশ্রীকে বন্দি করেন। এই সংবাদ পাওয়ামাত্র থানেশ্বররাজ রাজ্যবর্ধন মালব আক্রমণ করে দেবগুপ্তকে হত্যা করেন। কিন্তু কনৌজ উদ্ধার বা রাজ্যশ্রীকে মুক্ত করার আগেই তিনি শশাঙ্কের হাতে নিহত হয়েছিলেন। রাজ্যবর্ধনের হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে কিছু বিতর্ক আছে। বাণভট্টের রচনা ও হিউয়েন সাঙ-এর বিবরণ মতে, শশাঙ্ক কাপুরুষের মতো বিশ্বাসঘাতকতা দ্বারা রাজ্যবর্ধনকে হত্যা করেছিলেন। এই কারণে *'হর্ষচরিত'* গ্রন্থে শশাঙ্ককে 'গৌড়াধম' বলে নিন্দা করা হয়েছে। কিন্তু *ড. আর. সি. মজুমদার* মনে করেন, শশাঙ্কের প্রতি ধর্মীয় বিদ্বেষবশত বাণভট্ট বা হিউয়েন সাঙ তাঁর চরিত্রে কলঙ্ক লেপনের উদ্দেশ্যে এই বিবরণ দিয়েছেন। কিন্তু *আর. জি. বসাক* প্রমুখ আধুনিক গবেষকরা মনে করেন, সমকালীন তথ্যের ভিত্তিতে একথা বলা সংগত যে, শশাঙ্ক আকস্মিক আক্রমণ দ্বারাই রাজ্যবর্ধনকে হত্যা করেছিলেন। অবশ্য প্রাচীন রাজনৈতিক ধারার বিচারে তাঁর এই কাজ অস্বাভাবিক বা অনৈতিক ছিল না।

রাজ্যবর্ধনের মৃত্যুর পর হর্ষবর্ধন থানেশ্বর ও কনৌজের রাজা হন। তিনি ভ্রাতৃহত্যার প্রতিশোধ নিতে শশাঙ্কের বিরুদ্ধে অগ্রসর হন। ইতিমধ্যে শশাঙ্কের শক্তিবৃদ্ধিতে শঙ্কিত হয়ে কামরূপরাজ ভাস্করবর্মন হর্ষের সাথে যোগ দেন। রাজ্যবর্ধনের দশ হাজার সেনার অবশিষ্টাংশ সেনাপতি ভণ্ডীর অধীনে প্রত্যাগমন করেছিল। পথে হর্ষের সাথে দেখা হলে হর্ষ ভণ্ডীর ওপর বাহিনীর ভার দিয়ে প্রথমে রাজ্যশ্রীকে উদ্ধার করেন। তারপর গঙ্গাতীরে ভণ্ডীর বাহিনীর সাথে মিলিত হন। এর পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহ কোন্ পথে অগ্রসর হয়েছিল, সে সম্পর্কে নিশ্চিতভাবে কিছু বলা যায় না। বাণভট্ট বা হিউয়েন সাঙ কারোর

Scanned by CamScanner

লেখাতেই শশাঙ্কের সঙ্গে হর্ষের যুদ্ধ বা তার ফলাফলের কোনো উল্লেখ নেই। একমাত্র 'আর্যমঞ্জুশ্রী-মূলকল্পে' বলা হয়েছে যে, অসাধারণ পরাক্রমশালী তাঁর (রাজ্যবর্ধনের) কনিষ্ঠ ভ্রাতা (হর্ষবর্ধন) বহু সৈন্যসহ বিখ্যাত সোমের (শশাঙ্কের) রাজধানী পুণ্ড্রনগরীর বিরুদ্ধে অভিযান করেন। তিনি দুর্বৃত্ত সোমকে পরাজিত করেন ও স্বীয় রাজ্যে প্রত্যাবর্তন করেন।

কিন্তু আর্যমঞ্জুশ্রী-মূলকল্পের ঐতিহাসিকতা সম্পর্কে পণ্ডিতগণ প্রশ্ন তুলেছেন। ড. *মজুমদারের* মতে, এই গ্রন্থ ছিল কতকগুলি কিংবদন্তীর সমাবেশ মাত্র। তিনি বলেছেন, *"It would be extremely unsafe to accept the statement recorded in this book as historical."* তা ছাড়া পুণ্ড্রনগরী শশাঙ্কের রাজধানী ছিল না, কিংবা হর্ষ ওই নগরীতে কোনো অভিযান করেছিলেন বলে হিউয়েন সাঙ তাঁর বর্ণনায় উল্লেখ করেননি। সুতরাং হর্ষ শশাঙ্কের বিরুদ্ধে তেমন কোনো সাফল্য অর্জন করতে পারেননি বলে মনে হয়। কারণ হিউয়েন সাঙের বর্ণনা থেকেই জানা যায় যে, মৃত্যুর সময় পর্যন্ত মগধ শশাঙ্কের অধীনস্থ ছিল। *মা-তোয়ান-লীনের* বিবরণ থেকে জানা যায় যে, হর্ষ ৬৪১ খ্রিস্টাব্দে *'মগধের রাজা'* উপাধি নেন ও তারপরে উৎকল, কোঙ্গদ জয় করে রাজমহলের কাছে শিবির স্থাপন করেন। কিন্তু হিউয়েন সাঙ-এর বর্ণনা অনুসারে এর আগেই ৬৩৭-'৩৮ খ্রিস্টাব্দের অনতিকাল পূর্বে বোধিবৃক্ষ ছেদনের মতো পাপকাজের ফলস্বরূপ শশাঙ্ক মৃত্যুবরণ করেছিলেন। সুতরাং শশাঙ্ক জীবিত থাকাকালীন হর্ষ তাঁর রাজ্য দখল করতে পারেননি। সম্ভবত শশাঙ্কের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র মানবদেবকে পরাজিত করে হর্ষ ও ভাস্করবর্মন বাংলাদেশ ভাগ করে নেন।

শশাঙ্ক ছিলেন শৈব। হিউয়েন সাঙের বিবরণ থেকে জানা যায় যে, তিনি বৌদ্ধদের ওপর নানারকম অত্যাচার করেছিলেন। যেমন—কুশীনগর বিহার থেকে বৌদ্ধগণের বিতাড়ন, পাটলিপুত্রে বুদ্ধের চরণচিহ্ন অঙ্কিত প্রস্তরখণ্ড গঙ্গাজলে নিক্ষেপকরণ, বোধিবৃক্ষ ছেদন ও সর্বশেষে একটি বুদ্ধমূর্তি ধ্বংসের অপচেষ্টা। এইসব কারণে বাণভট্ট তাঁকে *'গৌড়াধম', 'গৌড়ভুজঙ্গ'* ইত্যাদি নামে ব্যঙ্গ করেছেন। বাস্তবিকই, প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে কোনো রাজার এই ধরনের ধর্মীয় সহনশীলতার অভাব খুবই দুর্লভ ঘটনা। এজন্য কোনো কোনো ঐতিহাসিক এ ধরনের আচরণের সঠিক ব্যাখ্যা খোঁজার চেষ্টা করেছেন। তাঁরা মনে করেন যে, হয়তো মগধের বা শশাঙ্কের রাজ্যের অন্য অঞ্চলের বৌদ্ধগণ বৌদ্ধসম্রাট হর্ষবর্ধনের প্রতি এতই সহানুভূতিসম্পন্ন ছিলেন যে, তারা নিজদেশের রাজার বিরুদ্ধাচরণেও কুণ্ঠিত হত না। এদিকে যেহেতু শশাঙ্কের সঙ্গে হর্ষের দীর্ঘ সংগ্রাম চলেছিল, তাই হর্ষের অনুরাগী নিজের বৌদ্ধ-প্রজাদের প্রতি তিনি সর্বদা সদয় আচরণ করতে পারেননি। তা ছাড়া শশাঙ্কের এই বৌদ্ধ-নির্যাতনের কাহিনি কিছুটা অতিরঞ্জিত বলেও মনে হয়। কারণ হিউয়েন সাঙ-এর বিবরণ থেকেই জানা যায় যে, তিনি তাম্রলিপ্ত ও কর্ণসুবর্ণে বৌদ্ধস্তূপ দেখেছিলেন এবং তখন গৌড়ের বৌদ্ধমঠে বহু বৌদ্ধ নিশ্চিন্তে জীবনযাপন করতেন।

শশাঙ্ক কেবল শক্তিশালী বাংলাই গঠন করেননি, উত্তর ভারতীয় রাজনীতিতে তাকে মর্যাদার আসনেও প্রতিষ্ঠিত করেন। শশাঙ্কের আদর্শে উদ্‌বুদ্ধ হয়ে পরবর্তীকালে পালরাজারা বাংলাকে কেন্দ্র করে সাম্রাজ্য গঠনে প্রয়াসী হয়েছিলেন। তাই ঐতিহাসিক ড. ***রমেশচন্দ্র মজুমদার*** লিখেছেন, *"He (Sasanka) laid the foundation of the imperial fabrick in the shape of realised hopes and ideals on which the Palas built at a later age."* প্রশাসক হিসেবে শশাঙ্ক স্বতন্ত্র রীতির প্রবর্তন করতে চেয়েছিলেন। একেই ***নীহাররঞ্জন রায়*** 'গৌড়তন্ত্র' আখ্যা দিয়েছেন। শশাঙ্কের সময়েই বাংলার প্রশাসনে আমলাতন্ত্রের প্রাধান্য স্বীকৃতি লাভ করে।

Scanned by CamScanner